Subject: Bengali, SEM-II, BNG -203, Unit:II (Raktakarabi)

'রক্তকরবী' নাটকের 'রূপক- সাংকেতিকতা'

সুজিতকুমার পাল, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

- -

অভিনয় শিল্পের ভাবনায় নাটক লেখা হয়ে থাকে। মানুষের আনন্দদানের জন্য যখন নাটক লেখা হত তখন পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসিক কাহিনী বা সামাজিক কাহিনী সহজভাবে উপস্থাপন করা হত - এটা এক ধরনের নাটক রচনার রীতি বা শৈলী। আবার রূপক সাংকেতিক নাটকের মাধ্যমে বিষয় প্রকাশ করাও একধরনের রীতি বা শৈলী। আসলে বিষয়কে (content) নানা আঙ্গিকের (Form) মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। তাই বিষয় যদি আধেয় হয় তাহলে আঙ্গিক হল আধার। এই দুটিকে একত্রে প্রকাশ করার কৌশল রচনারীতি বা শৈলী (style)। শৈলী ভাবনা মানুষের মজ্জাগত, একে নিজস্ব ঢঙে সাহিত্যে প্রকাশ করা হয় মাত্র। অর্থাৎ বলতে চাইছি শৈলী মানুষের চিন্তন শক্তির পরিচয় দেয়। যেমন নাটকের ক্ষেত্রেই ধরা যেতে পারে সেই নাটকে বিষয়ের ব্যাপ্তি, ভাষা বা সংলাপ, সঙ্গীত ব্যবহার, চরিত্র, সময় নির্ধারণ নাট্যকারের নিজস্ব মননের পরিপ্রকাশ। আর এর প্রকাশের ক্ষেত্রে শৈলীর প্রয়োগ হয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সাংকেতিক নাটক নিয়ে চর্চা বা লেখা হয়নি। উনিশ শতক বাংলা সাহিত্যের নাট্যাকাশে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আর্বিভাব ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের হাতেই এই ধরনের নাটক রচনা সম্ভব হয়েছে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে সংকেতবাদীরা ইউরোপে তাঁদের ভাবনায় ইন্দ্রিয়াতীত অধ্যাত্মলোকের দিকে ঝুঁকলেন। জীবনকে তাঁরা কেবল বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে যুক্ত রাখতে চাইলেন না। ব্যাপ্তির স্পর্শে অতীন্দ্রিয় জগতে প্রবেশ করতে চাইলেন। তার পূর্বে বস্তুবাদীরা চিন্তা - চেতনায় বিজ্ঞান বা বাস্তব ভাবনার সফল অসফল দিকের দ্যোতনায় তাঁদের সৃষ্টি সম্ভার ভরিয়ে তুলতেন। অতীন্দ্রিয় ভাবনা তাঁদের জগতের নয়। এঁদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ফরাসীতেই সংকেতবাদীদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁদের মতে বস্তুতান্ত্রিকতা সৌন্দর্য থেকে অনেক দূরে বিরাজমান। তাঁদের মতে জীবন কখনো যান্ত্রিক হতে পারে না। ফরাসী দেশে Gerand De Nervel, Baudelaire, Mallarme, Verlaine সাহিত্যিকেরা সংকেতবাদী হিসেবে পরিচিত। এঁদের ভাবনায় অতীন্দ্রিয় দিব্য উপলব্ধি সৌন্দর্যস্বরূপ। তাঁরা শান্তির জন্য স্বপ্নের জগৎকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। স্বপ্ন অবচেতন মনের উপলব্ধি। অবচেতন ও চেতন সত্তার প্রয়োগ তাঁদের সাহিত্যেও ঘটেছে।

ফরাসী দেশের পাশাপাশি সুইডেনের ইবসেন ও স্ট্রীণ্ডবার্গ, জার্মানির গেরহার্ট হাউপ্টম্যান, এমিলি ভারহারেন, ইংল্যাণ্ডের উইলিয়ম ব্লেক, আইরিশ নাট্যকার ইয়েটস্, নরওয়ের মেটারলিঙ্ক, রাশিয়ার শেকভ সাংকেতিকতার আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাংকেতিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁদের লেখা উল্লেখযোগ্য নাটক হল মেটারলিঙ্কের 'Blue Bird','The Princess Maleine', 'The Intruder','Palleas et Melisanda', 'The Death of Tintagiles', 'Aglavaine and Selysette' ইবসেনের 'The Wild Duck', 'The Doll's House', 'The Master Builder', 'Rosmersholm', 'Hedda Gabler', ইয়েটসের 'The Shadowy Waters', 'The Hour Glass', হাউপ্টম্যানের 'The sunken Bell', 'Hannele', 'Henry of Aue', রাশিয়ার নাট্যকার আদ্রিভের 'Life of Man', 'Professor Storitsym', । নাটকগুলির ভাবনায় সংকেতের মধ্য দিয়ে এক অতীন্দ্রিয় সুদূরলোকের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের এই নাটকে কখনো কখনো স্বপ্নময় রহস্যলোকের দিকটিও চলে এসেছে। তাই অনেকেই বলে থাকেন সাংকেতিক নাটকে রোম্যান্টিকতার একটা স্থান থেকেই যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের পূর্বে সাংকেতিক নাটকের উদ্ভব হয়নি। এই ধরনের নাটক লেখার জন্য যেটা জরুরী সেটা হল অধ্যাত্মভাবনার সঙ্গে সুদূরের প্রতি আকর্ষণ। তারসঙ্গে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানব ভাবনা। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই শ্রেণির নাটক লেখায় কেউ পারদর্শী হননি। সাংকেতিক নাটকের প্রসঙ্গ এলে রূপক নাটকের প্রসঙ্গও স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। কারণ রূপক নাটকের মধ্যেই সংকেতের বীজ থাকে, আবার এটাও বলা যায় সাংকেতিক নাটকের অন্তরালে রূপকেরই ফল্গুস্রোত বয়ে চলে। তাই অনেকেই রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে রূপক সাংকেতিক বলার পক্ষপাতী। এবার রূপক ও সাংকেতিক নাটক বিষয়ে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। রূপক নাটকে বাইরের একটা অর্থ থাকে ভিতরে আর একটি অর্থ থাকে। দুটির অর্থ ভিন্ন হলেও ভিতরের অর্থেরই প্রাধান্য থাকে। বাইরের দিকে একটি সহজ সরল কাহিনি থাকলেও ভিতরের অর্থে নাট্যকারের ভাবনা সুদূরপ্রসারী হয়। এই ভিতরের অর্থেই নাট্যকার তাঁর ভাবনা প্রকাশ করে থাকেন। দুটি ভাবের মধ্যে কোনো মিল বা সংযোগ থাকে না।

রূপক নাটকে মূলত কাহিনীর থেকে প্রাধান্য পায় কোনো ভাব বা তত্ত্বকথা। যেখানে লেখকের ভাবনার সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সেজন্য নীতিকথার প্রাবল্য চলে আসে। তবে সেই নীতিকথা অমূর্তভাবে প্রকাশ পায়, মুখ্য হিসেবে নয়। স্বেচ্ছায় লেখক এই ভাবনা কাহিনির অন্তরালে নিয়ে আসেন। এই ভাবনা রূপ থেকে রূপাতীতের বা রূপ থেকে অরূপের, সীমা থেকে অসীমের। কখনো কখনো অধ্যাত্মভাবনা এখানে চলে আসে। প্রসঙ্গক্রমে 'চর্যাপদে'র কথা তুলে ধরা যেতে পারে। কবিরা তাঁদের অন্তরের ভাবনা রূপক এবং সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন সচেতনভাবে। যে কথা বা যে ভাবনা সহজভাবে বললে সহজিয়াদের সহজতত্ত্ব থাকে না। তাই তাঁরা ভিতরের অর্থের সাহায্যে তাঁদের তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন। চর্যাপদকাররা কবি হলেও আসলে এঁরা গীতিকবি। গানের মাধ্যমেই তাঁদের ভাবনা প্রকাশ করেছেন। এখানে বেশ স্পষ্ট রূপক সাংকেতিক ভাবনার নাট্যকাররা একদিকে যেমন কবি অন্যদিকে গীতিকার। কারণ রূপকে এবং সংকেতে সাধারণের প্রবেশ প্রায় দুঃসাধ্য। তাই সঙ্গীতের প্রয়োগের জন্যই সাধারণের কাছেও এর মাধুর্য অনেকগুণ বেড়ে যায়।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকেই 'চর্যাপদে' রূপক ও সাংকেতিকের ব্যবহার হয়েছে। তবে অধ্যাত্ম ভাবনা এখানে মুখ্য। মহাসুখ লাভের পথ হিসেবে অনেকক্ষেত্রেই সমাজজীবনের অন্তরালে অসীম মহাশূন্যের কথা বলা হয়েছে। এখানে কবির ভাবনার মধ্য দিয়ে অসীম ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এই ইঙ্গিতের জন্যই সংকেত ভাবনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এবার সাংকেতিক নাটকের দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সংকেতে বাইরের অর্থ ও ভিতরের অর্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। বরং সূক্ষ্ম যোগ থাকে। সংকেতে তাই লেখকের ভাবনা ও পাঠকের ভাবনার মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক। যেমন সাহিত্যে কখনো কখনো দেব দেবীর সংকেতের কথা বলা হয়ে থাকে – 'রাধা কৃষ্ণ' বৈষ্ণবদেরই সংকেত দেয়, 'কালী' শাক্তদেরই সংকেত দেয়। আবার অঙ্কের ভাষায় বা সংখ্যা দিয়ে সংকেতের মাধ্যমে লেখক যে ভাবনার ইঙ্গিত দেন সেই ভাবনারই গুরুত্ব পেয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'রক্তকরবী'তে ৬৯ঙ, ৪৭ফ নামের চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন। চিত্রের মাধ্যমেও সংকেতের প্রকাশ হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় সংকেতের মাধ্যমে বিষয়কে অতিক্রম করে বিষয়াতীত কোনো ভাবনার প্রকাশ হচ্ছে। নাট্যকারেরা গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশের জন্য এক্ষেত্রে সচেতন ও অবচেতন মনের ভাবনায় সক্রিয় থাকেন। গূঢ় তত্ত্ব সংকেতের মাধ্যম ছাড়া সহজভাবে বলা সম্ভব হয় না। তাছাড়া এটা একধরনের শিল্পকলা।

সংকেতের প্রধান বিষয় অরূপকে রূপের মধ্যে ধরা। কারণ অরূপের বা অসীমের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তাই সংকেতই প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। 'চর্যাপদে' যে মহাসুখের কথা বলা হয়েছে সেটাও সাধারণভাবে বলা সম্ভব নয়। তাই তাঁরাও নানা সংকেতের আশ্রয় নিয়েছেন - 'হরিণ', 'নৌকো', 'তরু', 'দাঁড়', 'টিলা', 'শবর', 'সাঁকো' প্রভৃতি চিত্ররূপ শব্দ প্রয়োগ করে।

কেবল সংকেত ব্যবহারে নাটক রচনা সম্ভব নয়। কারণ কিছু শব্দ বা চিহ্ন দিয়ে একটি ভাবনার পরিপ্রকাশ হতে পারে না। ভাবনাকে নাটকে রূপদান করতে হলে একটি কাহিনির প্রয়োজন। এই কাহিনি সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হলে সচেতনভাবেই রূপকের আশ্রয় নেওয়া হয়ে যায়। অনির্দেশ্য ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংকেতের উপলব্ধি ঘটে হৃদয় দিয়ে। বুদ্ধির প্রাখর্য বা চিন্তা এখানে সঠিক ভাবনা এনে দেয় না। তাই এই ধরনের নাটককে এককভাবে সাংকেতিক নাটক বলাও যুক্তি সঙ্গত হয় না, একে রূপক সাংকেতিক নাটক বলাই যুক্তিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের নাটককে অনেকেই রূপক সাংকেতিক নাটক বলে থাকেন। "রবীন্দ্রনাথের রূপক- সাংকেতিক নাটকগুলিতে রূপক অংশ ও সংকেত স্তর আলাদা করে দেখানো যায়। তবে রূপক ও সংকেত দুটি পৃথক সমান্তরাল ধারায় বয়ে চলে না। উভয়ে মিলে যায় এক শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে। নাটকের অন্তঃশরীর ঘিরে থাকে এক সুষম ঐক্য ও ছন্দ।" [১]

সাংকেতিক নাটকের উদ্ভব তত্ত্বকথার ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েই। উনিশ শতকের ইউরোপীয় সংকেতবাদীদের সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মূলত তত্ত্বকথার স্বরূপেই নাটকগুলি লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১১), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'রথের রশি' (কালের যাত্রার অন্তর্ভুক্ত, ১৯৩২) এবং 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) নাটকগুলি রূপক সাংকেতিক নাটক হিসেবে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের নাটক বৈচিত্র্যের সম্ভারে পরিপূর্ণ। 'রক্তকরবী' এমনই বৈচিত্র্য প্রধান নাটক। বাংলা নাটকের জগতে এই নাটকটি অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। 'রক্তকরবী' নাটকে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজে যেমন পেশাগত দিক থেকে নানা শ্রেণির মানুষ থাকে এখানেও রাজা আছে, প্রজা হিসেবে সর্দার, মোড়ল, গোঁসাই, অধ্যাপক, পালোয়ান, খোদাইকর, খননকারী শ্রমিক শ্রেণির মানুষ আছে। কিন্তু দুটি শ্রেণির মানুষ এখানে এসেছে। যন্ত্র সভ্যতার পক্ষ হিসেবে যক্ষপুরীর রাজা, সর্দার, মোড়ল, গোঁসাই, অধ্যাপক ও শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে রঞ্জন, নন্দিনী, কিশোর, বিশুপাগল, ফাগুলাল এসেছে। এরা প্রত্যেকেই যক্ষপুরীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে খননকার্যের সঙ্গে যুক্ত। রাজার নির্দেশে তাদের বাঁচা ও মরা, কোনো মুক্ত চিন্তার প্রকাশ এখানে নেই। এককথায় যন্ত্র যেমন নিজের কাজ করে যায় তেমনভাবেই রাজা, সর্দার ও মোড়লের নির্দেশের শৃঙ্খলে এখানকার মানুষ কাজ করে যায়। তাদের সতর্কতার জন্যই কেউ কাজ ছাড়া অন্য ভাবনায় ভাবিত হতে পারে না। ''এই রাজ্যের যাঁরা সর্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা একসময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে।"[২] নাটকটির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই বলেছেন - "ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নাম কী সে- সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ- খোদাই চলছে, এইজন্যেই লোকে আদর করে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে। এই নাটকে এখানকার সুড়ঙ্গ খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।"[৩]

নাটকে প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ নন্দিনীর মধ্যেই প্রথম এসেছে। নন্দিনীর সহযোগীরা রঞ্জন, কিশোর, বিশুপাগল প্রত্যেকেই রাজার নিজেকে অনুশাসনের মধ্যে আটকে রাখার বিরুদ্ধে। নন্দিনী চায় রাজার জালের মধ্যে আটকে থাকা দূর করে মানুষটাকে বের করে আনতে। সে অধ্যাপককে বলেছে –' তোমাদের ঐ সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ঐ বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।'(৩৫৮) এরমধ্যে প্রতিবাদ আছে ঠিকই কিন্তু ধ্বংসাত্মক নয়। মানুষের

কাজ প্রতিবাদের বিষয় হলেও মানুষটা আসলে ঘৃণার নয়। তাই রাজার সম্মুখীন হয়েও সে প্রতিবাদের ভাষায় জিজ্ঞাসা করে - 'পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?' নন্দিনী চায় মানুষ মুক্তভাবে স্বাধীন হয়ে বাঁচুক, তাই সে গান গায়, গান শোনে। রাজা নন্দিনীর কথায় মুগ্ধ হয়ে ক্লান্ত, রিক্ত হাত বাড়িয়ে দেয়। আবার এদিকে ভালোবাসার মানুষ রঞ্জনকে নন্দিনী কাছে পেতে চায়। সমস্যা সঙ্কুল সমাজে ভালোবাসার আলো ফুটিয়ে তুলতে চায়।

বিশু, কিশোর নন্দিনীর প্রতিবাদের প্রকৃত সহচর। এরা শ্রমিক, সুড়ঙ্গ করে তাল তাল সোনা তুলে আনা এদের কাজ। তাদের ব্যক্তি পরিচয় কাজের পরিচয়ে মুছে গেছে। তাই বিশুর পরিচয় ৬৯ঙ, ফাগুলাল ৪৭ফ। বিশুর কথায় আক্ষেপ ফুটে ওঠে –'গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ- পঁচিশের ছক। বুকের ওপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।' এখানে সংখ্যা সংকেতের অন্তরালে রূপকের ভাবনা এসেছে। তাই দেখা যায় মানুষের মত করে এরাও বাঁচতে চায়। এদের এই বক্তব্যে প্রতিবাদের ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

নন্দিনীর স্পর্শে যক্ষপুরীর মানুষ বাঁচার পথ ফিরে পাচ্ছে দেখে সর্দার, মোড়ল ভীত- সন্ত্রস্ত। তারা নন্দিনীর সঙ্গে কারো যাতে সাক্ষাৎ না হয় তার ব্যবস্থা করতে উদ্যত। নন্দিনীর জন্যই শ্রমিকেরা তাদের মানতে চায় না। তাই তারা রঞ্জনকে, কিশোরকে, বিশুকে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে মিথ্যা অভিযোগে বন্দী করেছে। নন্দিনী প্রতিবাদী হয়ে সর্দারকে বলেছে- 'আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।' এমন তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ নন্দিনীর মধ্যে থেকে বেরুবে ভাবা যায়নি। যে কিনা গান, ভালোবাসা, ফুল নিয়ে মানুষের মধ্যে আলো ফুটিয়ে তুলতে চায়, সে এমন প্রতিবাদ করবে আশাতীত। তবুও নাট্যকার নন্দিনীর মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিলেন। তাই তিনি বলেন - "জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে- মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাকভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে- বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিকতে দেয় না বুঝি।"[৪]

শেষপর্যন্ত রঞ্জনকে নন্দিনী পেলেও জীবিত পেল না, রাজার বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাজা রঞ্জন ও কিশোরকে হত্যা করেছে। তবে রঞ্জনের মৃত্যু রাজাকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। তারপরই রাজা বুঝতে পেরেছে তারই শক্তি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রাজাও নন্দিনীর সঙ্গে নিজের শক্তির বিরুদ্ধে নিজেই প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। এ প্রতিবাদ মানুষের মত করে বাঁচার প্রতিবাদ, মুক্ত – স্বাধীন জীবনের জন্য প্রতিবাদ। এমনই সংকেতের দ্যোতনা রাজার বিরুদ্ধে রাজার নিজের লড়াই- এ।

রক্তকরবী নাটকে প্রতিবাদের ধরনেই এসেছে সংকেত। নন্দিনী চরিত্র, রাজা চরিত্র (যাকে মকররাজ বলা হয়), রঞ্জন, কিশোর চরিত্র এক এক ভাবনার প্রকাশ। রক্তকরবী, কুঁদফুল, গান, রাজার জালের মধ্যে আবদ্ধ থাকা, শ্রমিকদের সংখ্যায় নামকরণ – সংকেতের প্রকাশ। আসলে এখানে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী মানুষদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে তাদের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। শেষপর্যন্ত কর্ষণজীবী মানুষের বাঁচার আলো দেখিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

'রক্তকরবী' নাটকের নামের মধ্যেই সংকেত ও রূপক দুটি ভাবনা একসঙ্গে কাজ করেছে। রক্তকরবী ফুল হিসেবেই এই নাটকে এসেছে। কোনো ব্যক্তির নাম হিসেবে নয়। ফুল সুন্দরের সংকেত দেয়। আবার লাল ফুলের অন্তরালে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের ভাবনার দ্যোতনা দেয়। নন্দিনী রক্তকরবী পরিধান করে থাকে। এটা তার বাহ্যিক প্রকাশ কিন্তু ভেতরে সে প্রতিবাদী। রাজার কাজের সে প্রতিবাদ করে। সর্দার, মোড়লের কাজের ধরনকে ব্যঙ্গ করে। তাল তাল সোনা খুঁড়ে তোলার জন্য শ্রমজীবী মানুষদের বন্দী করে কাজ করানোর মধ্যে দেখানো হয়েছে ধনবান মানুষের শোষকরূপের পরিচয়। আবার জালের মধ্যে রাজার নিজেকে আটকে

রাখার মধ্যেও সংকেত - একটা ভাবনার মধ্যেই বন্দী করে রেখেছে রাজা। বাইরের মুক্ত ভাবনার সঙ্গে রাজার পরিচয় ঘটেনি।

রাজার হাতে মরা ব্যাঙ - এটাও সংকেত ও রূপকের দ্যোতক। রাজা নিজেই বলেছে - "এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকে। এইভাবে কী করে টিকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টিকে- থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?" (৩৭৩) রাজাও বলেছে মৃত্যু ওকে (ব্যাঙকে) মুক্তি দিয়েছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো রাজা যতক্ষণ জালের অন্তরালে থেকে নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলেছে ততক্ষণ রাজা হিসেবে সংলাপের কথা নাট্যকার বলেননি। 'নেপথ্যে' হিসেবে তুলে ধরেছেন। রাজাও জালের আড়ালে একজন বন্দী মানুষ। সেও নিয়মের দাস। রাজাই নিয়ম তৈরি করেছে, আবার রাজা সেই নিয়মের জালেই আটকে পড়েছে। সেই নিয়মকে হাতিয়ার করে সর্দার মোড়লরা রাজাকেই পুতুল করে রেখেছে। রাজা, সর্দার, মোড়লদের তাই কোনো নাম নেই। তাদের কাজ, তাদের পরিচয় হয়েছে। নন্দিনী রাজাকে পুতুল হিসেবে তিরস্কার করেছে - "তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না!" (৩৭৪) 'পুতুল' এখানে সংকেত ও রূপক ভাবনার প্রকাশ। সর্দার, মোড়লদের ইচ্ছার পুতুল রাজা। নন্দিনী রাজাকে 'পুতুল' বলার মধ্য দিয়ে রাজার নিষ্প্রাণ কাজকেই বোঝানো হয়েছে।

নন্দিনী রাজাকে জালের ভিতরে যে অবস্থায় দেখেছিল - "ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল; তাকে দাঁড়ের উপর বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল।" (৩৭২) এখানে 'বাজপাখি' সংকেতের দ্যোতনা দেয়। ভয়ঙ্কর এক ভাবনা প্রতীকের চিত্রে দেখলেও নন্দিনীকে দেখে রাজা ভয়ঙ্কর হতে পারেনি। বরং নন্দিনীর মধ্যেই ভালোবাসার পরশ পেতে চেয়েছে। কেউ তাই নন্দিনীকে এড়িয়ে যেতে পারেনি, রাজাও পারেনি।

নন্দিনীর বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে রঞ্জনও তাকে রক্তকরবী বলে সম্বোধন করে - "রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর করে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।" (৩৫৯) 'রক্তকরবী' নামের মধ্যেই রূপকের পূর্বাভাষ। সারামন- প্রাণ- অঙ্গ জুড়ে রঞ্জনের ভালোবাসার স্পর্শে নন্দিনী নিজেকে ভরিয়ে রাখতে চায়। রঞ্জনও তাই চায়। রক্তকরবী ফুল যেমন সুন্দরের আভাষ দেয় তেমনি প্রতিবাদী ভাবনার প্রেরণা দেয়। নন্দিনী যেন তারই স্বরূপে পরিপূর্ণ।

সর্দারের সংলাপে সংকেতের বার্তা এনেছে। সর্দার বলেছে - 'ঐ -যে ট ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ টা হচ্ছে মোড়ল। মূর্ধন্য- ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।" (৩৬৮) বর্ণ ও সংখ্যায় এক একটি মানুষের পরিচয়। সেই হিসেবে সর্দারের, রাজারও কোনো নাম নেই। এখানে সকলেই পরিচয়হীন মানুষের ভীড়ে পরিপূর্ণ। যারা কেবল নন্দিনীর পক্ষের তাদের নামের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কারণ তারাই বাঁচার মন্ত্রে দীক্ষিত। এটাও রূপকের অভিব্যক্তি।

এখানে আকর্ষণজীবী ও কর্ষণজীবী হিসেবে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত মানুষের দল। এটাও রূপকের প্রকাশ। আকর্ষণজীবী দলের প্রধান রাজা। সর্দার, মোড়লরা রাজার দলের লোক। তাদের সম্পর্কে রঞ্জনের মৃত্যুর পর রাজার উক্তি - "ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ। আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।"(৩৮৯) 'যন্ত্র' বলতে এখানে সর্দার, মোড়লদের বোঝানো হয়েছে। যারা রাজার নির্দেশেই তৈরি অথচ রাজাকে তারা অমান্য করেছে।

রঞ্জনের মৃত্যু এখানে সংকেতের মধ্য দিয়ে রূপকের দ্যোতনা দেয়। মৃত্যু এখানে মুক্তির রূপকে ব্যক্ত হয়েছে। নন্দিনী বলেছে - ". . . মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে - ও কখনো মরতে পারে না।" (৩৯১) তাই রাজাও প্রকৃত মানুষের মতোই কর্ষণজীবীদের দলে চলে এসেছে। রঞ্জনের মৃত্যুর কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। আর রঞ্জনের এই নাটকে একটিও সংলাপ নেই এবং

মঞ্চেও সচলভাবে উপস্থিতি নেই। অথচ রঞ্জনের ভূমিকা প্রধান। রাজাকে যতটা না বেশি নন্দিনী টলাতে পেরেছে তার থেকে বেশি কাজ করেছে রঞ্জনের মৃত্যু। কাজেই রঞ্জনের মৃত্যু এখানে সংকেত ও রূপকের মাত্রায় যুক্ত হয়েছে। রাজাও সেই অর্থে মুক্তি পেয়েছে।

কিশোর চরিত্রও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তিরই বার্তা এনে দিয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ হয়ে কাজ করলেও নন্দিনীর হয়ে সে নন্দিনীকে ফুল তুলে দেবার কথা দিয়েছে। "তুমি- যে বলেছিলে। রক্তকরবী তোমার চাই- ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজেপেতে একজায়গায় জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।" এখানে 'জঞ্জাল' বলতে রূপকের বার্তা দেয়। এই যক্ষপুরীর পরিবেশকেই জঞ্জাল হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক ও চিকিৎসক এখানে সংকেত ও রূপক চরিত্র হিসেবে উপস্থিত। অধ্যাপক চরিত্রে আলাদা ভাবনা কাজ করেছে। অধ্যাপকের সঙ্গে সংলাপ কেবল নন্দিনীর। অধ্যাপকের কাজ অধ্যাপনা হলেও এখানে সেই কাজ এই নাটকে নেই। অধ্যাপকের এই উপস্থিতি রূপকের অন্তরালে 'তত্ত্বকথা'র সূত্র এলেও এখানে এর প্রয়োগ ভাবনা নেই। নন্দিনী তাই অধ্যাপকের কথায় কান দেয়নি। অধ্যাপক বলেছে নন্দিনী সম্পর্কে - ". . . এই যক্ষপুরে আমাদের যা- কিছু ধন সব ঐ ধুলোর নাড়ির ধন - সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি সে তো ধুলোর নয়, সে যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।" (৩৫৮) এখানে 'আলোর' রূপকের অন্তরালে ব্যক্ত হয়েছে নন্দিনী সম্পর্কে অধ্যাপকের ধারণা। যক্ষপুরীতে অধ্যাপকের প্রয়োজনীতা নিয়ে সংশয় হতেই পারে। তবু নন্দিনীকে 'তত্ত্বকথা' বোঝানোর সংলাপে স্পষ্ট হয় অধ্যাপকের কাজ সম্পর্কে। প্রকৃত জীবনের সন্ধানে এরা তত্ত্ববাদী। এই তত্ত্বকথা বাস্তব জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই। নন্দিনীও অধ্যাপকের তত্ত্বকথা শুনতে চায়নি। বরং চিকিৎসক রাজাকে পরীক্ষা করে জানিয়েছে -"দেখলুম রাজা নিজের 'পরে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ রোগ বাইরের নয়, মনের।"(৩৮৪) এখানে মানসিক চিকিৎসার প্রসঙ্গে চিকিৎসক আরও বলেছে -"ওরা বড়োলোক, বড়ো শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, তখন আর একটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো সর্দার, আর বড়ো দেরি নেই।" (৩৮৪) এই সংলাপে 'নিজের খেলনা ভাঙে'- র সংকেতে রূপকের ভাবনা পরিস্ফুট। শেষপর্যন্ত দেখা যায় রাজার চিকিৎসার সঙ্গে রাজার কাজের মিল পাওয়া যায়। রাজা নিজেই নিজের যন্ত্র ভাঙার কাজে পথে নেমেছেন। এখানে চিকিৎসকও সংকেতের ভাবনায় মোড়া।

এই নাটকে উল্লেখ করার মতো দিক গানের প্রয়োগ। একটি গান নাটকের শুরুতে আছে আবার শেষেও আছে। গানটির এই ব্যবহারই রূপকের ভাবনায় দ্যোতিত। গানটি নন্দিনীর সঙ্গে রাজার সংলাপের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে -

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে - আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়"। (৩৬০ ও ৩৯২)

পৌষের গানে কৃষিজীবী মানুষের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। গানটি রাজার সামনেই গাওয়া হয়েছে। রাজা আকর্ষণজীবীদের প্রধান হলেও কর্ষণজীবী নন্দিনীর ডাকের ইঙ্গিত এই গানে ফুটে উঠেছে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে এই গানের মধ্যেও সেই ইঙ্গিত। রাজা শেষে কর্ষণজীবীদের মধ্যে চলে এসেছে। এটা রূপকেরই দ্যোতনা।

নন্দিনীর আর একটি গান আছে। রাজার সামনেই গানটি গেয়েছে -

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে- স্থলে বাজায় বাঁশি।

আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় ভাসি।(৩৭৫)

রাজাকে মানুষের মতো করে ভাবনায় ভাবিয়ে তোলার জন্য এমন গানের প্রয়োগ। 'ভালোবাসি ভালোবাসি' উদ্ধৃতির মধ্যে ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে এই ধারণারই সংকেত দেয়। তাই রাজা গান শুনে মরা ব্যাঙ ফেলে পালিয়ে যায়। রাজার মধ্যে মনুষ্যত্ব জেগে ওঠার সংকেত দেয়।

এছাড়া নাটকের সব গানগুলি বিশুর কণ্ঠে দেওয়া হয়েছে।

"তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুমভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক
ওগো দুখজাগানিয়া।" (৩৭০)

এই গানে নন্দিনীকে 'ঘুমভাঙানিয়া' ও 'দুখজাগানিয়া' বলার মধ্য দিয়ে রূপকের ইঙ্গিত দেয়। সকলকে প্রাণের মন্ত্রে জাগিয়ে রাখার প্রতীক নন্দিনী। এইরকম আর একটি গান –

"যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন্ তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অস্ফুট প্রদোষে।" (৩৭৬)

'সে' এখানে রূপকের সংকেত। অরূপের ভাবনায় গানটির প্রকাশ। বাহ্যিক জীবনে অপূর্ণতার প্রকাশ হিসেবে গানটিকে ধরা যায় না। তাই বিশুর গানটি অসীম ভাবনারও দ্যোতনা দেয়। এমন ধরনের আর একটি গান বিশু গেয়েছে নন্দিনীকে শুনিয়ে –

"ও চাঁদ, চোখের জলেও লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ার হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।" (৩৭১)

গানের মাধ্যমে রূপকে অরূপের মধ্যে ধরা যায়। আবার রূপকে অরূপের মধ্যে ভাবনার আলোকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই গানে তেমনই ভাবনার প্রকাশ। 'হাওয়া', 'অচেনার ধারে' শব্দগুলি এমনই উপলব্ধির প্রকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে।

পরিশেষে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে 'রক্তকরবী' কার? নন্দিনীর ? না সকলের ? আসলে নন্দিনীই তো সকলের। তাই নাটকের নামকরণে রবীন্দ্রনাথও বারবার পরিবর্তন করেছিলেন। রূপকে বা সংকেতে এমন হয়। নাটকে রূপের প্রসঙ্গও যেমন আছে তেমনি সংকেতের প্রসঙ্গে অরূপকে রূপের মধ্যে ধরার প্রসঙ্গও আছে। এর মূল তত্ত্বকথা মানবাত্মার মুক্তি। তাই সমালোচকের কথায় বলা যায় ''রক্তকরবী'তে যন্ত্রবদ্ধ মানুষের এবং যন্ত্রশক্তিতে শক্তিশালী রাজার শোচনীয় দুর্গতি এবং তা থেকে মুক্তির কথা বলা হয়েছে। মানবাত্মার মুক্তিতত্ত্বের বিষয়টিই নাটকের আসল তত্ত্ব। আর এ তত্ত্বকে রূপ দিতে গিয়ে যে কাহিনীকে গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শাসন ও শোষণের চিত্র, শ্রমিক- অসন্তোষ, শ্রমিক- বিদ্রোহের শেষে রাজা ও প্রজার মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন ও মুক্তির ইঙ্গিত নাটকের ভিতরে আছে কিন্তু বন্ধনপীড়িত মানবাত্মার মুক্তিকামনা ও শেষ পর্যন্ত মুক্তির ইঙ্গিত।"[৫] এমন জটিল সমস্যার সমাধান তাই এককভাবে কোনো শ্রেণি বিভাগে বিচার সম্ভব নয়। সেজন্য 'রক্তকরবী'র ভাবনা সকলের মধ্যেই ব্যপ্ত হতে চায়। এমন ভাবনা তো রূপক- সাংকেতিকতারই।

উৎস পরিচয়

১) নিমাইচন্দ্র পাল, রবীন্দ্র নাটকে আঙ্গিকঃ রূপক সাংকেতিক, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ ২৯

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, নাট্যপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২, পৃঃ ৩৫৫

৩) তদেব

৪) তদেব

৫) ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষাঃ রূপক- সাংকেতিক, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২, পৃঃ ১৬২

'রক্তকরবী'র মূল যে গ্রন্থ থেকে সংলাপ ও গানগুলি নেওয়া হয়েছে –

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্তকরবী, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২

:সহায়ক গ্রন্থঋণ :

১) W B Yeats, Ideas of Good and evil, 2nd Edition, EBook(#32884), www.gutengerg.com, 18th June 2010

২) Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, 10th Edition, EBook(#6081), www.gutengerg.com, July 2004